

আল্লামা আমিন সফদর রাহ.

বিবেকের উদ্বোধনবন্দী

[আমার হানাফি হওয়ার গল্প]



মুজিব তাশফিন
অনূদিত

তরজুমাংে আহনাফ, ইমামুল মুনাযিরিন
আল্লামা আমিন সফদর রাহ.

বিবেকেব ডোবোনবন্দি

[আমার হানাফি হওয়ার গল্প]

অনুবাদ
মুজিব তাশফিন

সম্পাদনা
মাওলানা ইলিয়াস আমিনী



কালানাতর প্রকাশনী

অনুবাদকের আরজ

প্রতিটি মানুষের জীবনে স্বপ্ন থাকে, স্বপ্ন পূরণের তীব্র ইচ্ছা থাকে। ছোটবেলা থেকেই আমার ভেতরে লেখালেখির প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ কাজ করতো। লেখার চেষ্টা করতাম, নিয়মিত মাসিক ছোটখাটো পত্রিকাগুলোতে লেখা পাঠাতাম। কর্মজীবন শুরু করার পর ব্যস্ততা একদম চেপে বসে, লেখালেখি করার ইচ্ছেটা মনের ভেতরেই আত্মহুতি দেয়।

বিগত কুরবানি ঈদ পূর্ববর্তী সময়ে কোন একদিন মাদরাসার অফিসে বসে কলিগগণ নানা বিষয়ে কথা বলছিলাম। স্বনামধন্য লেখক, বন্ধুবর মাওলানা আমিন আশরাফ সাহেব অনুবাদকর্মে হাত দেবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। সামনে ঈদের লম্বা ছুটি, তাই সময়টা কাজে লাগানোর চিন্তায় তাৎক্ষণিক অনলাইনে ঢুকেপড়ি বইয়ের সন্ধানে। অনেকগুলো বই ডাউনলোড করলেও পাকিস্তানের আল্লামা আমিন সফদর রাহ.'র 'মে হানাফি ক্যাইসে বানা' বইটি আমাকে অন্যরকম আকর্ষণ করে। তাৎক্ষণিক বইটি অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেই।

চলমান সময়ে আহলে হাদিসদের ফেতনাবাজি এবং ধোকাবাজি প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিধায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারি মনে হয়েছে। মূলত সে কারণেই বইটির অনুবাদকর্মে হাত দেয়া।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে লেখালেখি এবং অনুবাদে হাত দেবার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন সহকর্মী ও বন্ধুবর মুফতি উবায়দুল্লাহ। বইটির অনুবাদকাজ শেষ হবার পর কম্পোজ এবং প্রুফ দেখায় তিনি ছাড়াও সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর মাওলানা মোফাজ্জল হোসাইন ও সহকর্মী মাওলানা সালিমুল্লাহ খান। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুক। আমিন!

বইটি প্রকাশে দেশের সাড়াজাগানো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'কালান্তর প্রকাশনী' এগিয়ে আসায় আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

লেখালেখিতে আমার একদমই কাঁচা হাত। তদুপরি মানুষমাত্রই ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই পাঠকসমাজের কাছে অগ্রিম ক্ষমার বিনীত আরজ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
نحمده ونصلي علي رسوله الكريم... اما بعد

আমরা গ্রামে বসবাস করতাম। ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগ্রত ছিল যে, কুরআনে পাকের শিক্ষা কোথায় গ্রহণ করা যায়। আমাদের গ্রামে একটি মসজিদ ছিল। যেখানে প্রতি শুক্রবারেই ঝগড়া-বিবাদ হতো। বেরলভিপন্থীরা চাইতো যে, এই মসজিদের ইমাম তাদের দল থেকে নিযুক্ত হবে, লা-মাযহাবিরা চাইতো, তাদের ইমাম নিযুক্ত হবে। আমাদের দেওবন্দি ধারার একটিই ঘর ছিলো, যাকে না কেউ গণনা করতো, না কেউ হিসাবে ফেলতো।

কখনো কখনো ঝগড়া এতো দীর্ঘায়িত হতো যে, ছয় মাস পর্যন্ত মসজিদে কোনো ইমাম থাকত না। আবার কখনো একসঙ্গে দুই জামাত শুরু হয়ে যেত। আমার মুহতারাম পিতা এ নিয়ে খুব পেরেশান ছিলেন এবং অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন- ‘আহলে বিদআত’ এর চেয়ে ‘লা-মাযহাবি’রা যেহেতু তাওহিদের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে, তাই ওখানেই আমাকে কুরআন শেখার জন্য পাঠাবেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুরআন শিক্ষার জন্য একজন ‘লা-মাযহাবি’ হাফেয সাহেবের নিকট আমাকে সোপর্দ করলেন।

শিক্ষাপদ্ধতি

যেহেতু আমি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি, প্রাথমিক শিক্ষাতো ছিলোই। তাই প্রথম পারা থেকে সবক শুরু হলো। উস্তাদজি দু-তিন আয়াত বলতেন আর আমি পুনরাবৃত্তি করতাম। তারপর উস্তাদজি আমাকে শোনাতেন যে, “আমি অমুক হানাফি মুফতি সাহেবকে পরাজিত করে দিয়েছি, অমুক হানাফি আলেমকে লা-জওয়াব করে দিয়েছি। দুনিয়ার মাঝে কোনো হানাফি বা বেরলভি নেই, যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবেলা করতে পারবে”। তারপর কোনো একটি প্রচারপত্র নিয়ে বসে যেতেন আর বলতেন, ‘দেখো! এই বিজ্ঞাপনটি বিশ বছরের পুরনো, এতে দুনিয়ার সকল হানাফিদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র একটি হাদিস দেখাও, যাতে রফয়ে ইয়াদাইনকে বর্তমান সময়ে রহিত করা হয়েছে। এমন একটি হাদিস দেখাও যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; একটা সময়ে আমার দ্বীন রহিত হয়ে যাবে আর ইমাম আবু হানিফার তাকলিদ তথা অনুসরণ আমার উম্মতের উপর ফরজ হয়ে যাবে।

এই বিজ্ঞাপনটি দেওবন্দ পাঠানো হয়েছিল এবং হাদিস দেখানোর উপরে পুরস্কারও ঘোষণা হয়েছিল; কিন্তু তাদের কেউ সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস করেনি। আমার মতো 'শূন্য মস্তিষ্ক' লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য উস্তাদজির এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট ছিল।

একদিন যখন তিনি একথা বললেন যে, 'আমি একবার দিল্লি যাচ্ছিলাম, তখন নামাজ আদায়ের জন্য দেওবন্দ নামলাম। মাদরাসার সকল উস্তাদ-ছাত্র সে সময়ে মসজিদে উপস্থিত ছিল। আমি দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে বলতে লাগলাম যে, এই বিজ্ঞাপনটি বিগত ২০ বছর যাবত আপনাদের নিকট পাঠানো হচ্ছে, তবুও আপনারা কোনো হাদিস দেখান না কেন? তখন সেখানকার একজন শিক্ষক লজ্জিত স্বরে বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলল, 'মাওলানা সাহেব! আপনি তো জানেন, আমরা হলাম হানাকি। ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর ফিকাহ পড়ি, না কখনো হাদিস পড়েছি, না দেখেছি। আপনি বারবার আমাদের কাছে হাদিস চেয়ে লজ্জা দেন কেন?'

উস্তাদজির এই কথা শুনে আমি নিরাশ হয়ে যেতাম। কেননা আমি ঘরে শুনেছিলাম যে, দেওবন্দ মাদরাসা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় মাদরাসা। যখন আমাদের উস্তাদজি সেই দেওবন্দ মাদরাসার উস্তাদকে লা-জওয়াব করে দিয়ে এসেছেন, এখন হাদিস কোথায় পাবো?

ইখতেলাফ কী?

একদিন আমি উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করলাম, হজরত! আপনার এবং আহলুসসুন্নাহ আলেমদের মধ্যকার পার্থক্য কী?

উস্তাদজি বললেন, বেটা! আমরা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কালিমা পড়ি, তারাও নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কালিমা পড়ে। এ ব্যাপারে আমরা একমত। পরবর্তীতে আমরা বলি যে, যার কালিমা পড়ো, তার কথাই মানো। তারা বলে, না! কালিমা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই পড়বো; কিন্তু কথা শুনবো ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, উস্তাদজি! ইমাম আবু হানিফা রাহ. যেহেতু মুসলমান আলেম ছিলেন, অবশ্যই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাই লোকদের বোঝাতেন। কেননা, 'খায়রুল্ল কুরন্ন' (সর্বোত্তম যুগ)-এর সময়ের মুসলমান আলেমের ব্যাপারে এ কথা ধারণাই করা যায় না যে, তাঁরা

জেনে-বোঝে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কথা বলবেন।

উস্তাদজি বললেন, ইমাম আবু হানিফা রাহ. অনেক ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সময়ে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসসমূহ একত্রিত ছিল না। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা রাহ. বহু মাসআলা কিয়াসের মাধ্যমে বর্ণনা করতেন। পাশাপাশি এটাও বলে দিতেন, ‘আমার যে কথা হাদিসের বিপরীত পাবে, তা ছেড়ে দিবে।’ কিন্তু বর্তমানের হানাফিরা জেদ করে এবং আবু হানিফার কথাই অন্ধের মতো মানে।

ওই সময় আমার ততোটা বুদ্ধি হয়নি যে, উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করবো—এমন কী কারণ, যার কারণে উম্মতের জন্য হাদিস একত্রিত করার পূর্বে ফিকাহ একত্রিত করার প্রয়োজন হলো? সিহাহ-সিত্তাহ-এর লেখকগণ সকলেই নিশ্চিতভাবে ফিকাহ-র চার ইমামের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই তো নিজেদের কিতাবে না হানাফি মাজহাবের বিরুদ্ধে অধ্যায় রচনা করেছেন, না শাফেয়ি মাজহাবের বিরোধিতা করেছেন।

হাদিসের জ্ঞান

উস্তাদজি আমাকে বলতেন যে, কাপড় যেমন কাপড়ের দোকানে পাওয়া যায়, গোশত যেমন কসাইয়ের দোকানে পাওয়া যায়, তেমনিভাবে হাদিস শুধুমাত্র ‘আহলে হাদিস’-এর নিকট পাওয়া যায়। অন্যত্র কোনো মাদরাসায় তো হাদিস পড়ানোই হয় না। তুমি যদি আমাদের মাদরাসা ছেড়ে চলে যাও, সমগ্র জীবন তালাশ করতে করতে তুমি অস্থির হয়ে যাবে; কিন্তু কোনো হাদিসের দেখা তুমি পাবে না। তোমার কান নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি হাদিসও শুনতে পারবে না। রাসূলে আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস কেবলই আমাদের এখানে পড়ানো হয়।

সে সময়ে আমার তেমন জ্ঞান ছিল না এবং জানাও ছিল না যে, আহলে হাদিসের ভাই আহলে কুরআনও ছিল এবং তারাও এই দাওয়াত দিতো। কিন্তু উস্তাদজির জন্য তো এটা আবশ্যিক ছিল যে, তিনি আমাকে বলে দিবেন—বেটা! কুরআন শুধুমাত্র আহলে কুরআন থেকে শেখা দরকার। কেননা, কুরআনের সঙ্গে আমাদের কী সম্পর্ক? অথচ উস্তাদজি আমাকে তা বলেননি।

মোদাকথা, আমাকে এ কথা বিশ্বাস করানো হলো যে, কেবল আমরা গুটিকয়েকজন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের প্রকৃত

শত শহিদের সওয়াব

আমার খুব ভালোভাবেই স্মরণ আছে যে, নফল ইবাদত আদায় করা তো অনেক দূরের কথা; বরং আমরা তা নিয়ে মজা করতাম। এমনকি সুন্নত ইবাদতসমূহ আমাদের নিকট খুব প্রয়োজনীয় ছিলো না। কেননা হানাফি লোকেরা নফল ও সুন্নতসমূহ পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করতো। তবে হ্যাঁ, যে সকল সুন্নত মৃত হয়ে গেছে তা জীবিত করার জন্য আমাদেরকে খুব গুরুত্ব দেয়া হতো। উদাহরণস্বরূপ- জামায়াতের নামাযের মধ্যে পার্শ্ববর্তী লোকের টাখনুর সঙ্গে নিজের টাখনু লাগানো সুন্নত-যা মৃতপ্রায়। তার উপর আমল করার দ্বারা শত শহিদের সওয়াব মিলে।

এমনিভাবে উচ্চস্বরে আমিন বলা সুন্নত। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে লোক আমিন চুরি করে সে আমার উম্মতের ইয়াহুদি হয়ে গেল। এজন্য এতটা উচ্চস্বরে আমিন বলা যে, তার আওয়াজ হানাফিদের কান পর্যন্ত পৌঁছে। এর দ্বারা শত শহিদের সওয়াব পাওয়া যাবে, আর ইয়াহুদিদেরকে শায়েস্তা করার সওয়াব পৃথকভাবে পাওয়া যাবে। (ইয়াহুদি দ্বারা হানাফি লোকদের উদ্দেশ্য)

ফেকাহ-এর হাকিকত

উস্তাদজির নিকট অন্যান্য কিতাবের পাশাপাশি মৌলভি ইউসুফ জীপুরী এর কিতাব ‘হাকিকাতুল ফিকাহ’, মৌলভি মুহাম্মদ রফিক পাসরুরি-এর ‘শমশেরে মুহাম্মদিয়াহ বর আকায়েদে হানাফিয়াহ’ এবং মৌলভি মুহাম্মদ জুনাঘরি-এর ‘শামে মুহাম্মাদি’ কিতাবসমূহ ছিলো। উস্তাদজি আমাকে নিয়ে বসে যেতেন এবং এ কিতাবসমূহের কোনো একটি থেকে যে কোনো একটি মাসআলা শোনাতেন। অতঃপর উস্তাদজি এবং আমি পাঁচ মিনিট পর্যন্ত তওবা তওবা করতাম আর বলতাম যে, এমন খারাপ মাসআলা না হিন্দুদের কিতাবে আছে, না শিখদের কিতাবে আছে। হায় আল্লাহ! যদি হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান কেউ এই মাসআলা সম্পর্কে জেনে যায় তাহলে মুসলমানদের কতোটা জঘন্য ভাবে।

সারকথা হলো, আমার ভেতরে একথা খুব ভালো করে ঢুকিয়ে দিতেন যে, (নাউয়ুবিল্লাহ) হানাফি মাযহাব এতো খারাপ মাযহাব-হিন্দু, শিখ, অগ্নিপূজক এবং ইয়াহুদি-নাসারাসহ সবাই তাদের থেকে পানাহ চায়।

কর্মপদ্ধতি

যখন আমার মেধা পাকাপোক্ত হয়ে গেল, উস্তাদজি বলেন, ‘কোনো এক বা দু’জন সাধাসিধে হানাফি ডেকে বলবে যে, আমাদেরকে তোমাদের মৌলভি সাহেবদের নিকট নিয়ে চলো। তারা যদি হাদিস দেখাতে পারে তাহলে আমি হানাফি হয়ে যাবো।’

আমি তাই করতাম। যখন হানাফি কোনো যুবক আমাকে তাদের মৌলভি সাহেবের নিকট নিয়ে যেত, আমি জিজ্ঞেস করতাম, মাওলানা সাহেব! এই হাদিস দেখান যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে ছেড়ে আরু হানিফার তাকলিদ করো। প্রশ্ন করার পর কখনোই তাদের জবাব মনযোগ দিয়ে শোনতাম না। প্রতি দু’মিনিট পরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া লোকদের সাক্ষী রেখে বলতাম যে, দেখো! মৌলভি সাহেব একটি হাদিসও জানেন না। এটাতো স্বাভাবিক যে, মাওলানা সাহেব তখন রাগ করতেন আর আমি তখন চলে আসতাম। এর দ্বারা উস্তাদজি খুব খুশি হতেন।

উস্তাদজি কয়েকটি গ্রামে আমাকে নিয়ে সফর করেন এবং আমার খুব প্রশংসা করেন। বলতেন, দেখ! এই ছেলে হানাফি অমুক মাওলানাকে আটকে দিয়েছে, লা-জওয়াব করে দিয়েছে। বেচারী একটি প্রশ্নের জবাবও দিতে পারেনি। একটা হাদিসও দেখাতে পারেনি।

এরপর جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا বলে শ্লোগান দিতে থাকতেন।

ছয় উসুল

উস্তাদজি এই বিষয়ে খুব যোগ্য ছিলেন। তিনি বলতেন, হানাফিদের আটকিয়ে অপমানিত করার জন্য কুরআন-হাদিস কিংবা ফিকাহ’র জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এদের প্রত্যেককে বিরক্ত করার জন্য ১০০ শহিদের সওয়াব পাওয়া যায়।

১ নং উসুল

যখন কোন হানাফির সঙ্গে দেখা হবে, প্রথমেই তাকে এই প্রশ্ন করে বসো যে, আপনি যে হাতে ঘড়ি পরিধান করেছেন, তার প্রমাণ কোনো হাদিসে আছে?

এরকমের প্রশ্ন করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। তুমি ছয় বছরের বাচ্চাকে মেডিকেল স্টোরে পাঠিয়ে দিলে সে ওষুধের গায়ে হাত দিয়ে বলতে পারবে যে, এই ওষুধের নাম কোন হাদিসে আছে?

এ ধরনের প্রশ্ন করার পর কেউ যদি তা মসজিদে এসে বলতো যে, আমি অমুক হানাফি মৌলভি সাহেবের নিকট হাদিস জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে তো বলতে পারেনি। তখন লা-মাযহাবি বাচ্চা-বুড়ো সকলের জন্য ফরজ হয়ে যায় যে, মহল্লার প্রত্যেক গলিতে গলিতে তারা এই কথা মাইকিং করে বেড়াবে যে, অমুক হানাফি মৌলভি একটাও হাদিস পারে না।

২ নং উসূল

আল্লাহ না করুক, যদি তুমি কোথাও ফেঁসে যাও এবং কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে-তুমি যে পকেট পাঞ্জাবিতে লাগিয়েছো তা কোন হাদিসে আছে? তখন পেরেশান না হয়ে তাৎক্ষণিক তাকে উল্টো প্রশ্ন করো, নিষেধ আছে কোন হাদিসে এবং চিৎকার শুরু করে দাও যে, কাজ করার হাদিসও দেখাতে পারো না আবার কাজ না করার হাদিসও দেখাতে পারো না। সকল লা-মাযহাবি তখন বলবে যে, বেচারী হাদিস কোথেকে আনবে, সারাজীবন তো ফিকাহই পড়িয়েছে।

৩ নং উসূল

যদি কোথাও এমনভাবে ফেঁসে যাও যে, কেউ কোনো হাদিসের কিতাব নিয়ে এসে বললো, তোমরা তো আহলে হাদিস। দেখো! কতো হাদিস আছে যেগুলোর উপর তোমাদের কোনো আমল নেই। তাহলে এমতাবস্থায় চিন্তিত হয়ো না। তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চস্বরে একটি হাসি দিয়ে বলবে যে, এ হাদিসের কোনো সনদ নেই, এটা কোন হাদিসের কিতাব থেকে নিয়ে এসেছেন?

আমরা তো কেবল বুখারি ও মুসলিম মানি। আর যদি বেশি অপারগ হই, তাহলে সিহাহ-সিত্তাহ মানি। বাকি সকল কিতাবকে শক্তভাবে অস্বীকার করবে; বরং হাসির পাত্র বানাবে এবং এতোটা মজা নিবে যে, কিতাব উপস্থাপনকারী লজ্জিত হবে এবং কিতাব লুকিয়ে ফেলে নিজের জীবন নিয়ে পলায়ন করে।

৪ নং উসূল

যদি ঘটনাক্রমে কোনো লোক এই ছয় কিতাবের কোনো এক কিতাব থেকে এমন কোনো হাদিস এনে দেখায়, যা তোমার বিপরীত চলে যায়, তাহলে

দ্রুত এমন কোনো শর্ত নিজের পক্ষ থেকে লাগিয়ে দাও যে- এই শব্দটা দেখাও, তাহলে একলাখ টাকা পুরস্কার দিবো।

উদাহরণস্বরূপ- রফয়ে ইয়াদাইন ‘মানসুখ’ হয়েছে। ঠিক এভাবে রফয়ে ইয়াদাইনের সঙ্গে মানসুখ শব্দ দেখাও। হাদিস অবশ্যই সহিহ, সরিহ, মারফু, গায়রে মাজরুহ হতে হবে।

নিজের শর্তকৃত শব্দের উপর এতোটা চেচামেচি করো যে, সে নিজেই চুপ হয়ে যাবে।

৫ নং উসুল

এরপরও যদি বিপক্ষীয় লোক ঐ শব্দ পেয়ে যায় এবং বলে- দেখো! তুমি যে শব্দের অনুসন্ধান করেছিলে তা পাওয়া গেছে। তাহলে শরীরে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে একথা বলে দাও- এ হাদিস ‘যইফ’, ‘যইফ’, ‘যইফ’। তারপর সে হাদিস না মানার ওপর শোরগোল বাধিয়ে দাও, আর বলো- দেখো! মাওলানা সাহেব হাদিস সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও রাখে না।

৬ নং উসুল

সর্বশেষ উসুল হলো, উস্তাদজি সবদী গুরুত্ব দিতেন এ ব্যাপারে, যে নামায পড়ে না তাকে এ কথা বলো না যে, আপনি নামায পড়েন। তবে হ্যাঁ, যে নামায পড়ে তাকে অবশ্যই এ কথা বলো যে, আপনার নামায হয় না। শুধুমাত্র এই ৬ নম্বর উসুলই আমাদের মাযহাবের মূল বুনিয়াদ।

আমার পিতা নামায-রোযার খুব পাবন্দ ছিলেন এবং তাহাজ্জুদগোজার ছিলেন। প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হতো যে, আপনার নামায পড়ে কোনো লাভ নেই। না আপনার নামায কবুল হয়, না তাহাজ্জুদ কবুল হয়, না অন্য কোনো ইবাদত কবুল হয়। পিতাজি আমার কথার জবাব দিতেন শান্তভাবে। ঝগড়া করতেন না। বলতেন, বাবা! তোমাদের নামায হয়, আমাদের নামাযও হয়।

আমি বলতাম, কতো বড় ধোঁকা! একই আল্লাহ নামাযের দুই পদ্ধতি বলেছেন? একটি মদিনায়, আরেকটি কুফায়? আমাদের নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র নামায, যা আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

পিতাজি বলতেন, আবোল তাবোল বন্ধ করো।

আমি এটাকে অনেক বড় বিজয় ভাবতাম আর দম্ভভরে বলতাম, আমি আপনাকে অনেক সম্মান করি, নতুবা ফিকাহ’র গোমর ফাঁস করে দিতাম। তার দুর্গন্ধে সবার মাথা ফেটে যাবে।

এভাবেই কয়েকটি বছর অতিবাহিত হলো।

বাসা বদল

আমরা সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাই। সেখানে উৎসাহ এবং সাবাশ দেবার মতো কেউ ছিল না। একসময় শহরের একটি মাদরাসায় পড়ার জন্য যেতে শুরু করলাম। এলমে নাহ্, বুলুগুল মারাম, নাসাই শরিফ পড়তাম সেখানে। সম্পূর্ণ কিতাব পড়া কখনোই উদ্দেশ্য ছিলো না। কেবলমাত্র ইমামের পিছনে ফাতেহা পড়া, রফয়ে ইয়াদাইন, জোরে আমিন বলা, বুকে হাত বাঁধা, পায়ের সঙ্গে পা লাগিয়ে দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে যদি মাসআলা এসে যেত, তাহলে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া সুনিশ্চিত ছিল।

খতমে নবুয়ত আন্দোলন

সে সময়ে ১৯৫৩ সালের খতমে নবুওয়াত আন্দোলন চলছিলো। আমাদের মতাদর্শী তথা লা-মাযহাবি সবাই এই খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কেননা তাঁরা কাদিয়ানিদের মুসলমান বলতেন। সে আন্দোলন চলাকালীন সময়ে ‘চাচ্চা’ এলাকার ২জন বুয়ুর্গ, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবদুল হান্নান ও তালিমুল কুরআন রাজাবাজার রাওয়ালপিন্ডির সাবেক শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির সাহেব গ্রেফতার হন। তাঁরা দু’জনকেই সাহওয়াল জেলে প্রেরণ করা হয়। ওই জেলে পূর্ব থেকেই খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ মাওলানা জিয়া উদ্দিন সাহেব (ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ) ছিলেন।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবদুল হান্নান সাহেব ও মাওলানা আব্দুল কাদির সাহেব দু’জনই দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেগ ছিলেন এবং হযরতুল আল্লাম সায়্যিদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীর খাস ছাত্রদের মধ্য থেকে অন্যতম ছিলেন। মাওলানা জিয়া উদ্দিন দা.বা. তাঁদেরকে মুক্তি পর ‘ওকাড়া’য় দরস প্রদানের জন্য রাজি করিয়ে ফেলেন। সুতরাং উভয় হযরত মুক্তির পর ‘ওকাড়া’য় আগমন করেন।

স্থানীয় আহনাফগণ ‘ওকাড়ায় জ্ঞান ও দর্শন এর বৃষ্টি’ শিরোনামে অনেক বিজ্ঞাপন প্রচার করে এবং হযরতগণকে চমৎকার ও মনোমুগ্ধকর আয়োজনের মাধ্যমে স্বাগতম জানান।

বিতর্কের আগ্রহ

সে সময়ে আমার লা-মায়হাবি উস্তাদ ছিলেন মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেব। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, শোনলাম মাওলানা আনওয়ার শাহ-এর ছাত্র এসেছে, তাদের সঙ্গে মুনাযারা করতে হবে।

আমি বললাম, হযরত! তারা কী করবে? স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রাহ. যদি কবর থেকে উঠে আসে তথাপিও আমাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। আমাদের নিকট হাদিস আছে, তাদের নিকট কিয়াস।

উস্তাদজি আমার এ কথায় খুব খুশি হয়ে দু'আ দিলেন এবং ‘পৃথিবীর সকল হানাফিদের জন্য এগারো হাজার টাকার খোলা চ্যালেঞ্জ’ শিরোনামে একটি ইশতেহার দিয়ে বললেন, যাও! বিজয় সুনিশ্চিত তোমারই।

সাক্ষাৎ

ওই দুই হযরত ঈদগাহ মাদরাসায় অবস্থান করছিলেন। আমি দেখলাম মাওলানা আবদুল হান্নান সাহেবের চারপাশে বহু মানুষের ভিড় এবং মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবের আশপাশে মানুষজন কিছুটা কম। আমি ধারণা করে নিলাম যে, এ দু’জনের মধ্যে প্রথমজন তথা মাওলানা আবদুল হান্নান সাহেব বড় আলেম। তাই আমি তাঁর পিছনে বিছানায় বসে গেলাম। হযরতের কাঁধের উপর মেসেজ শুরু করলাম। হযরত দুই তিনবার আমার দিকে দেখলেন এবং চুপ থাকলেন। চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ করো?

আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। দ্রুত পকেট থেকে প্রচারপত্র বের করে হযরতের সামনে খোলে ধরলাম এবং আরজ করলাম, হযরত! আহলে হাদিসের লোকেরা আমাদের খুব ছোট করে রেখেছে। তারা হাদিস প্রতি হাজার টাকা পুরস্কারও দিচ্ছে; কিন্তু আমাদের উলামায়ে কেরামের নিকট কোনো হাদিস নেই। আপনি দয়াপরবশ পথপ্রদর্শন করেন এবং এই হাদিস লিখে দেন, যেখানে এই ১১টি প্রশ্নের জবাব থাকবে।

হযরত বললেন, আমি পাঞ্জাবে অধ্যাপনা কম করেছি এবং আমার উর্দুও তেমন স্পষ্ট নয়। মাওলানা আবদুল কাদির সাহেব পাঞ্জাবে অনেক অধ্যাপনা করেছেন এবং তাঁর উর্দু বেশ ভালো। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহও আছে। তুমি তাঁর নিকট বুঝে নাও।

আমি মাওলানা আবদুল কাদের সাহেবের নিকট যেতে লাগলাম। হযরত আবদুল হান্নান সাহেব মাওলানা সাহেবকে আওয়াজ দিলেন, মাওলানা!

ছেলেটি বুদ্ধিমান, আপনি তাকে বোঝান। আল্লাহ তাআলার নিকট কামনা করি যে, প্রথম বলকেই অন্তর থেকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা দূরীভূত করে দিবেন। হযরতের বলার দ্বারা মাওলানা সাহেব আমার হাত থেকে প্রচারপত্র নিয়ে পড়তে শুরু করেন।

মাওলানা সাহেব প্রচারপত্র পড়ছিলেন আর আমি মাওলানা সাহেবের চেহারা পাঠ করছিলাম। কখনো কখনো ঠোঁটের নিচে মুচকি হাসি প্রকাশ পেত। কখনো কপালে অসন্তুষ্টির ছাপ দৃষ্টিগোচর হতো। এভাবেই মাওলানা সাহেব পুরো পত্রটি পড়লেন।

হযরত সর্বপ্রথম বললেন, বেটা! নিয়্যত সঠিক করে নাও। যদি কোনো ব্যক্তি এই নিয়্যতে মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, দ্বীনের মাসআলা বুঝে এর উপর আমল করবে, তাহলে মাসআলা জিজ্ঞেস করার পৃথক সওয়াব আর আমল করার পৃথক সওয়াব। পক্ষান্তরে কটে যদি দুষ্টমি এবং ফিতনাবাজি করার নিয়্যতে মাসআলা জিজ্ঞেস করে, তাহলে জিজ্ঞেস করার জন্য পৃথক আর দুষ্টমি করার জন্য পৃথক গোনাহ হবে। আমি তো এই নিয়্যতে মাসআলা বুঝাবো যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন হবে।

আমি বললাম, আমিও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য মাসআলা বুঝতে চাই।

দলিল উপস্থাপন করার দায়িত্ব কার?

হযরত বললেন যে, এই বিজ্ঞাপনে অনেক ধোকা আছে। কিন্তু মৌলভির ধোকা কেবল মৌলভি-ই ধরতে পারে। সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। আরো বলেন, যদিও বিজ্ঞাপনদাতারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলে পরিচয় দেয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থে এরা মুনকিরে হাদিস তথা হাদিস অস্বীকারকারী। কেননা প্রসিদ্ধ হাদিসে আছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন “البينة على المدعي” অর্থাৎ দলিল বাদীর ওপর অপরিহার্য। হাদিসের ভাষ্যমতে দলিল বা সাক্ষ্য উপস্থাপন করবে বাদী এবং জাগতিক আদালতও সর্বদা বাদীর কাছেই দলিল চায়।

এই এগারোটা মাসআলার মাঝেই বাদী হলো লা-মাযহাবি। সুতরাং দলিল তো তাদের যিম্মাদারি। কিন্তু তারা তাদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য উল্টো আমাদেরকে প্রশ্ন করে বসে আছে।

হযরত বলেন, এটা উদাহরণ দ্বারা বুঝো- রাফেযি সম্প্রদায় আযানের মাঝে কিছু শব্দ বৃদ্ধি করে। এর প্রেক্ষিতে আমরা তো তাদের প্রশ্ন করতে পারি যে,

আপনারা কোন আয়াত বা হাদিসের দ্বারা এই অতিরিক্ত শব্দের দলিল দেন?
কমপক্ষে আলি রা. থেকে এই শব্দগুলো প্রমাণিত এমন কিছু দেখান।

কেয়ামত পর্যন্ত তারা কোনো জবাব দিতে পারবে না। কিন্তু তারা তাদের মূর্থ
অনুসারীদের ধোকা দেবার জন্য যদি এমন প্রশ্ন তৈরি করে, যেমনটা লা-
মাযহাবিরা করেছে-পৃথিবীর সকল গায়রে মুকাল্লিদ একত্রিত হয়ে এমন
একটি সহিহ, সরিহ, মারফু, গায়রে মাজরুহ হাদিস দেখাও যে, নবী কারিম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের মধ্যে এই অতিরিক্ত শব্দসমূহ বলতে
নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন এমন শব্দ দেখাতে পারলে একলাখ টাকা
পুরস্কার দিবো।

তুমি তোমার উস্তাদের কাছ থেকে এ হাদিস লিখে আনো অন্যথায় শিয়া
ধর্মের সত্য হওয়া এবং লা-মাযহাবি সম্প্রদায়ের মিথ্যা হওয়া মেনে নাও।

জেনে রাখো! দুনিয়ার সকল লা-মাযহাবি মিলেও এমন একটি হাদিস দেখাতে
পারবে না।

আমি বললাম, আমরা কেন হাদিস দেখাবো? যারা আযানের মাঝে শব্দ বৃদ্ধি
করে তারা দলিল উপস্থাপন করবে। আমরা কেন নিষেধের হাদিস দেখাতে
যাবো। এ ধরনের প্রশ্ন করাতো স্পষ্ট ধোকা।

হযরত বললেন, রফয়ে ইয়াদাইন তোমরা করো আর দলিল আমাদের কাছে
চাও। এটাও এমনই ধোকা।

অতঃপর হযরত বললেন, দেখো! কুরআনে পাকের প্রথম সূরা হলো
ফাতেহা। যার নাম ‘উম্মুল কুরআন’। অথচ তার উপরই অনেক ঝগড়া।
কেউ কেউ খাবারের উপর ফাতেহা পড়ে, কেউ আবার ইমামের পিছনে
ফাতেহা পড়ে। অথচ বুনিয়াদি ভিত্তিতে সূরা ফাতেহার উপর দুইটি
মাসআলা। ১. মাসআলায়ে তাওহিদ ২. মাসআলায়ে তাকলিদ।

খাবারের উপর ফাতেহা পাঠকারী লোকদের নিকট তাওহিদ ভালো লাগে না।
আর ইমামের পিছনে ফাতেহা পাঠকারী লোকদের নিকট তাকলিদ পছন্দ
নয়। অর্থাৎ ফাতেহা সম্পূর্ণ অর্থে পালন করতে কেউই চায় না।

এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কখনো খাবারের উপর পাঠকারী
লোকদের সঙ্গে তোমার মুনাযারা হয়ে যায় এবং তুমি প্রশ্ন করো, ইসালে
সওয়াবের নিয়তে খাবারের উপর ফাতেহা পড়ার হাদিস দেখাও। পাল্টা তারা
তোমাকে প্রশ্ন করলো যে, সারা পৃথিবীর সকল লা-মাযহাবি একত্রিত হয়ে
শুধুমাত্র একটি সহিহ, সরিহ, মারফু, গায়রে মাজরুহ এমন হাদিস দেখাও যে,

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার সামনে নিয়ে খাস ইসালে সাওয়াবের নিয়তে তার ওপর ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেছেন। খাস নিষেধের শব্দ দেখাতে পারলে লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবো।

হযরত বললেন যাও! এমন হাদিস নিয়ে আসো।

আমি বললাম, যখন খাবারের উপর ফাতেহা তারা পড়ে, দলিল তারাই আনবে, আমাদের নিকট কেন দলিল চাওয়া হয়?

হযরতজি বললেন, ইমামের পিছনে ফাতেহা কারা পড়ে? তোমরা নাকি আমরা? আমি বললাম, আমরা।

হযরত বললেন, তাহলে আমাদের কাছে কেন নিষেধের হাদিস চাও? শোয়াইব আ.'র জাতির মত নেবার বাটখারা একটি আর দেবার বাটখারা আরেকটি সাব্যস্ত করলে নাকি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কথা কি তোমার স্মরণ নেই, নিজের ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করো। (বুখারি)

খাস দলিলের তলব

হযরত বলেন বিবাদী থেকেও দলিল চাওয়া যায়; কিন্তু নির্দিষ্ট দলিল চাওয়া বৈধ নয়। এটাতো কাফেরদের পদ্ধতি ছিলো। তারা ওই মুজেয়াসমূহকে অস্বীকার করতো, মানতো না-যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মাধ্যমে প্রকাশ হতো; বরং নিজেদের পক্ষ থেকে শর্ত লাগিয়ে আদেশকৃত মুজেয়া চাইতো। এরপর যদি তাদের ইচ্ছানুযায়ী মুজেয়া না দেখানো হতো, তখন তাদের তো শুধু একথা বলার অধিকার ছিল যে, তারা বলবে- 'আমাদের দাবিকৃত মুজেয়া দেখাতে পারেনি'; কিন্তু তারা এই প্রোপাগান্ডা চালাতো-মুহাম্মদ কোন মুজেয়া-ই দেখাতে পারেনি।

এর উদাহরণ হল, তোমার নিকট একলোক এসে বললো, আমি অনেক গোনাহগার। ষাট বছর বয়স হয়েছে কিন্তু আমি কোনোদিন নামায পড়িনি। আজ তওবা করার জন্য এসেছি। আপনি আমাকে পরিপূর্ণ নামায শিক্ষা দেন। তবে আমার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র একটি শর্ত, নামাযের রাকাতসমূহ কুরআন দ্বারা প্রমাণ করবেন। তদ্রূপ সানা, তাশাহুদ, এবং দুরুদ শরিফের শব্দসমূহও কুরআন থেকে দেখাতে হবে। কেননা আমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত কেবল তারই কিতাবের অনুসরণে করতে চাই; অন্যকিছুর অনুসরণে নয়।

তাহলে কি তুমি তাকে সবকিছুই কুরআন থেকে দেখাতে পারবে? যদি না পারো আর সে বলে, কুরআন থেকে নামায দেখাতে পারলো না। তাহলে তো তা ঠিক আছে। কিন্তু সে যদি এটা বলে- এই মাসআলা সম্পর্কে কোনো সমাধানই জানো না, তা কি ঠিক হবে? দলিলকে খাস করা এটাকেই বলে। যদি পৃথিবীর কোনো আদালতের মাধ্যমেও এই সমাধান করা হয়, তখন আদালতও বাদীর কাছে সাক্ষী চাইবে। বাদী যে সাক্ষী পেশ করবে, সে সাক্ষ্যকে জেরা করার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সাক্ষ্যের জেদ করার অনুমতি আদালত তোমাকে দিবে না। যেমন, বাদী যায়েদকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করলো, আদালত সাক্ষ্যকে জেরা করার অনুমতি তোমাকে দিবে। কিন্তু তুমি বললে যে, আমি তার সাক্ষ্য মানি না। প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলেই মানবো। তাহলে পৃথিবীর কোনো আদালত কি তোমার এই ভুল উসূল মানবে?

ঈমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর নাকি স্বীয় উস্তাদের শর্তের ওপর?

হযরত বলেন, কাফেররা যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ওপর ঈমান আনতো; না বরং নিজেদের দাবিকৃত মুজেরার ওপর ঈমান রাখতো। ঠিক তদ্রূপ তোমাদের ঈমান নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ওপর নয়; বরং তোমাদের ঈমান শুধুমাত্র স্বীয় উস্তাদের শর্তের ওপর। কাফেররা যেভাবে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতো, আমরা যা বলি তা আল্লাহ তাআলার দ্বারা বলিয়ে নাও বা করিয়ে নাও, তাহলে ঈমান আনবো অন্যথায় না। তেমনিভাবে তোমাদের উস্তাদ তোমাদেরকে কোনো একটা ইবারত লিখে দিয়ে বলে যে, হুবহু এই শব্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলিয়ে নাও, তাহলে আমরা মানবো। অন্যথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতোপূর্বে যা কিছু বলেছেন তার কিছুই মানবো না।

এখন আমি মনে মনে বুঝতে পারলাম যে, মাওলানা সাহেব যা বলছেন কথাতো একদম ঠিক। আমাদেরকে যদি হাজার হাদিসও শুনিয়ে দেওয়া হয় আমরা তা মানি না; বরং এসব হাদিসকে বাতিল বলে ছেড়ে দেই। কেননা আমাদের উস্তাদ যে শব্দের কথা বলেছেন হাদিসের মাঝে সে শব্দ নেই এই

আমরা তা মানি না; বরং এসব হাদিসকে বাতিল বলে ছেড়ে দেই। কেননা, আমাদের উস্তাদ যে শব্দের কথা বলেছেন হাদিসের মাঝে সে শব্দ নেই এই কারণে। এটা তো স্বয়ং নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দেওয়া যে, আপনি যদি কোনো মাসআলা বলতে চান, তাহলে শব্দ আমাদের থেকে জেনে নিন এবং মাসআলার শর্তসমূহ আমাদের নিকট জিজ্ঞেস করে নেন। কেননা, আমাদের শর্তসমূহ এবং শব্দসমূহ যদি হাদিসে না বলেন, তাহলে আমরা তা মানবো না।

একটি প্রশ্ন

আমি বললাম, হজরত! আপনি নিজেও তো এমন প্রশ্ন বানাতে পারেন, যাতে হাদিস জানতে চাওয়া হবে আবার পাশাপাশি পুরস্কারের ওয়াদাও থাকবে। তাহলে তো আমাদের উস্তাদ এ ধরনের হাদিস পেশ করতে সক্ষম হবে না; বরং কেবলই ধোকা বলে দিবে। যেমন আপনি এই প্রশ্নগুলোকে ধোকা বলেছেন।

মাওলানা সাহেব মুচকি হেসে বললেন—‘ধোকাও কি ভাল কাজ যে, আমি তা শুরু করে দেব’? আমি বললাম, আমাকে বোঝানোর জন্য আপনি অবশ্যই একটি প্রশ্ন বানিয়ে দিন।

আমার কথার প্রেক্ষিতে মাওলানা সাহেব ওই বিজ্ঞাপনের উল্টোপাঠে একটি প্রশ্ন লিখলেন, ‘আপনি নিজের শর্তানুযায়ী এমন একটি সহিহ, সরিহ, মারফু, গায়রে মাজরুহ হাদিস পেশ করুন, যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শরয়ি দলিল শুধুমাত্র সহিহ, সরিহ, মারফু, গায়রে মাজরুহ হাদিসের উপরই নির্ভরশীল। যদি এমন হাদিস দেখাতে পারেন, তাহলে ৫০ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করা হবে’।

মাওলানা সাহেব এটা লিখে তার উপর দস্তখত করে দিলেন। আমি তখন ভাবনায় পড়ে যাই। কারণ, আমার উস্তাদ সবসময় বলতেন যে, চ্যালেঞ্জ তো ৫০ হাজার টাকার কমে করবে না; কিন্তু পাঁচ পয়সার চ্যালেঞ্জের উপরও কখনো দস্তখত করবে না। অথচ মাওলানা সাহেব নিশ্চিত মনে ৫০ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জের উপর দস্তখত করে দিলেন।

প্রত্যাবর্তন

অতঃপর আমি সেই প্রচারপত্রটি নিয়ে ফিরে এলাম। উস্তাদজি ব্যাকুল হয়ে গেইটে আমার অপেক্ষায় দাঁড়ানো ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, আমার ইশতেহারে কেউ কি হাত লাগানোর সাহস করেছে?

আমি বললাম, আজ তো একজন ভালো করেই হাত লাগিয়ে দিল এবং তিনি নিজেও আপনার কাছ থেকে একটি হাদিস জানতে পাঠালো। আপনি যদি তা লিখে দিতে পারেন, তাহলে তিনি আপনাকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলে দস্তখতও করে দিয়েছেন। উস্তাদজি! আপনি হাদিস লিখুন, আমি পুরস্কার নিয়ে আসছি।

ডিসেম্বরের তীব্র শীতের মাঝেও উস্তাদজি প্রশ্নটি একবার পড়েই তিন তিনবার কপাল থেকে ঘাম মুছলেন। উস্তাদজির ঘামের তীব্রতা দেখেই প্রশ্নের ওজন আমার আন্দাজ হয়ে যায়। অন্যদিকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার হেদায়াতের সময়ও ঘনিয়ে আসছিল।

প্রশ্নটি পাঠ শেষ করে উস্তাদজি প্রথমেই বললেন, ‘এই শর্তটি ধোকাবাজির জন্য লাগানো হয়েছে’।

আমি বললাম, হজরত দ্বীনের মাঝে ধোকা? তাও আবার কুরআন এবং হাদিসের নামে? মাওলানা সাহেব তো আজ আমাকে এ কথাই বোঝালেন যে, ‘তোমাদের ইমান নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নয়; বরং শুধুমাত্র তোমাদের উস্তাদের বানানো শর্তের উপর’। এখন তো আপনি নিজেও এ সকল শর্তসমূহকে ধোকা বলছেন। এমন হলে আমি যাব কোথায়?

না পাইলাম মূর্তি,
না পাইলাম শ্রষ্টা,
না আছে এদিকের পথ,
‘না আছে ওদিকের পথ।’

আরও একটি প্রশ্ন

শ্রেণিকক্ষে উস্তাদজির টেবিলে কিতাবাদি আমিই গুছিয়ে রাখতাম সবসময়। তার মধ্যে দুটো মোটামোটা কিতাব ছিল। যার একটির ওপর লেখা ছিল ‘দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসিন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহ.-এর সহিহ বুখারি শরিফের তাকরির’, আর অন্যটির উপর লেখা ছিল

উল্লেখ্য যে, সে সময় উলামায়ে আহনাফকে মুশরিক বলাটা অনেক সওয়াবের কাজ এবং উস্তাদজিকে খুশি করার মোক্ষম পদ্ধতি ছিলো। আমার এ কথায় উস্তাদে মুহতারাম খুব খুশি হলেন এবং সাবাশ দিতে দিতে বললেন, 'বেটা! মাসআলার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে তা সত্য; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তাদের এই কিতাব দুটো না পড়ে আমি বুখারি-তিরমিযি কোনোটাই পড়তে পারি না'।

উস্তাদজির একথা আমার অন্তরে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিলো। বললাম, উস্তাদজি! আপনি এসকল লোকদের সঙ্গে ধোকাবাজি করেছেন, যাদের কিতাব পড়া ব্যতীত আপনি বুখারি, তিরমিযি পড়তে পারেন না। আমার একথা শুনে উস্তাদজি আমাকে বললেন 'যাও! এখান থেকে চলে যাও, আর কোনোদিন এখানে আসবে না'।

আমি বললাম, উস্তাদজি! আপনি হাদিসটা লিখে দেন, আমি পুরস্কার নিয়ে আসি। এবার উস্তাদজি রেগে গেলেন এবং আমাকে একটি থাপ্পড় মেরে বললেন, 'ভাগো এখান থেকে'।

দ্বিতীয়বার গমন

আসরের নামাযের পর দ্বিতীয়বার আমি মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁকে বললাম, হযরত! এখন একথা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, এসকল প্রশ্ন কেবলই ধোকা। কিন্তু এটা বলেন যে, আপনারা হাদিসের বিপরীতে ইমাম আবু হানিফার কথাকে কেন প্রাধান্য দেন?

হযরত বললেন, 'এটা পুরোপুরি মিথ্যা কথা'। হযরত আমাকে 'ইলাউস সুনান' কিতাবটি পড়ার জন্য দিলেন। পাশাপাশি তার একটি উর্দু অনুবাদও দিলেন। যখন আমি হাদিস পড়তে শুরু করলাম, তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম। এটা কতো বড় মিথ্যা! অথচ তা আমরা সকাল-সন্ধ্যা বলি।

একদিন আমি উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করলাম, উস্তাদজি! 'ইলাউস সুনান'-এর হাদিসগুলো আপনি কেন মানেন না এবং এই হাদিসসমূহের উপর আমলকারী লোকদেরকে 'আহলে রায়' তথা যুক্তির অনুসারি কেন বলেন? আর হ্যাঁ, এ কিতাবের পূর্ণাঙ্গ জবাব কোনো গায়রে মুকাল্লিদ আলেম লিখে থাকলে তা আমাকে বলুন, আমি তাও পড়বো। কিন্তু অনুসন্ধানের পর একথা আমার

বুঝে আসে যে, এ কিতাবের জবাব দেবার মতো ক্ষমতা দুনিয়ার সকল লামাযহাবিদের কারোর নেই।

মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবের প্রদত্ত ‘ইলাউস সুনান’ কিতাবটি আমি ওই মাদরাসায় বসেই পড়তাম। এ কারণে উস্তাদজি খুব রাগ করতেন। এমনকি কখনো কখনো আমাকে প্রহারও করেছেন। কোনো কিছুতেই আমার বুঝে আসতো না যে, ‘আহলে হাদিস’ হযরতগণ হাদিসের এতো দূশমন কেন? আমি উস্তাদজিকে বলতাম, আপনি আমাকে হাদিসের কিতাব পড়তে দেন না কেন? তিনি শুধু ধমকের সুরে একটা কথাই বলতেন, ‘হাদিসের এ কিতাব তুমি আমাদের মাদরাসায় কেন আনলে? এ কিতাব তুমি আমাদের মাদরাসায় পড়তে পারবে না’।

আমি একদিন মসজিদের দেয়ালে খুব সুন্দরভাবে এই হাদিস লিখে দিলাম-

ما اسفرتم بالفجر فانه اعظم بالاجر

অর্থাৎ ‘তোমরা ফজরের নামায ফরসা হবার পর আদায় করো, তাহলে সওয়াব বেশি পাবে।’ সেদিন মসজিদে শোরগোল শুরু হয়ে গেল যে, এই হাদিস কে লিখলো, কেন লিখলো? তাকে খুঁজে বের করে মেরে মসজিদ থেকে বের করে দাও।

পরের দিন মসজিদের দেয়ালে আবারো হাদিস লিখে দিলাম-

ابردو بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم

অর্থাৎ ‘তোমরা যুহরের নামায সূর্যের তাপদাহ কিছুটা কমে এলে পড়ো, কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের শ্বাস থেকে সৃষ্ট’। এজন্য আমাকে জবাবদিহী করতে হয়েছে যে, তুমি এমন ফেৎনা সৃষ্টি করছো কেন?

পরবর্তী নামাযের পূর্বে আমি দেয়ালে আবারো হাদিস লিখে দিলাম-

فقيه واحد اشد علي الشيطان من الف عابد

অর্থাৎ ‘একজন ফকিহ শয়তানের উপর একহাজার আবেদ’র চেয়েও শক্তিশালী।’ আমার মনে হচ্ছিলো যে, হাদিসের প্রতি এদের যতোটা বিদ্বেষ, অন্য কারোই এমন না।

তৃতীয়বার গমন

আমি আবারো মাওলানা সাহেবের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাকলিদে শখছি’-কে কী বলো?

আমি বললাম ‘শিরক’।

তৃতীয়বার গমন

আমি আবারো মাওলানা সাহেবের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তাকলিদে শখছি'-কে কী বলো? আমি বললাম 'শিরক'।

হজরত বললেন, 'তবকাতে হানাফিয়্যাহ, তবকাতে মালেকিয়্যাহ, তবকাতে শাফেয়িয়্যাহ এবং তবকাতে হামলিয়্যাহ-এর মাঝে যতো মুহাদ্দিসিনের কথা উল্লেখ আছে তারা সবাই কি মুশরিক'?

আমি বললাম, নিঃসন্দেহে মুশরিক।

হজরত বললেন, তাহলে তো সিহাহ-সিত্তাহ-এর মুসান্নিফগণ মুশরিক হয়ে যায়। তুমি 'বুলুগুল মারাম' পড়ো—ইবনে হাজার, শাফেয়ি তো মুশরিক; তুমি 'নাসায়ি শরিফ' পড়ো—তিনিও তো ইমাম শাফেয়ি রাহ.-এর 'মুকাল্লিদ'; তার মানে মুশরিক।

এসব কথা শুনে আমি উস্তাদজির নিকট চলে আসলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কোনও মুহাদ্দিস কিংবা কোনো ইতিহাসবিদ মুহাদ্দিসিনদের তালিকায় কোনো কিতাব 'তবকাতে গায়রে মুকাল্লিদিন' নামে লিখে থাকলে আমাকে দেখান। উস্তাদজি খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, 'তুমি তো ফেতনাবাজি শুরু করেছো। ছাত্রদেরকে 'ইলাউস সুনান' থেকে হাদিস শোনাচ্ছে এবং মসজিদের দেয়ালে নানা ধরনের হাদিস লিখে লাগাচ্ছে—আমরা এসব সহ্য করবো না। তুমি এসব বন্ধ করো। ছাত্রদের হাদিস শোনানো এবং দেয়ালে হাদিস লিখে লাগানো থেকে ফিরে আসো! অন্যথায় মাদরাসা থেকে চলে যাও। আমাদের নিকট 'তবকাতে গায়রে মুকাল্লিদিন' নামে কোনো কিতাব নেই। আমি সেখান থেকে আবার হজরতের নিকট আসলাম।

তখন হজরত আমাকে বললেন, 'ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে পাকিস্তান এবং ভারতে লা-মাজহাবিদের কোনো মসজিদ, কোনো মাদরাসা, কোনো কবরস্থান, কুরআনের কোনো তরজমা, হাদিসের কোনো তরজমা থাকলে আমাকে দেখাও। নামাজের পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলীসমূহ তাদের কোনো কিতাব থাকলে আনো।

আমি যখন এসব কথা আমার উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আমাকে বললেন 'তোমার কি ফেতনাবাজি ব্যতীত আর কোনো কাজ নেই'?

একটি ঘটনা

একদিন নাসায়ি শরিফের ক্লাস চলছিল। ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ করা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি ক্লাসে উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু সামনে কিতাব ছিল না।

উস্তাদজি জিজ্ঞেস করলেন ‘তোমার কিতাব কোথায়?’ আমি বললাম, ‘কামরায়’।

উস্তাদজি বললেন, ‘নিয়ে আসোনি কেন?’ আমি বললাম, ‘এটা তো মুশরিকের লেখা কিতাব, আমি কেন তাতে হাত দেব?’

উস্তাদজি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন ঠিকই; কিন্তু চুপ রইলেন।

ইমাম নাসায়ি স্বয়ং এই শিরোনামে অধ্যায় স্থাপন করেছেন-

باب تاويل قوله عز وجل و اذا قرى القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون
‘আল্লাহ তাআলার বাণী, “যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো, যেন তোমাদের উপর রহম বর্ষিত হয়” এর ব্যাখ্যা।’

এরপর ইমাম নাসায়ি হাদিস আনলেন *اذا قرأ فانصتوا* অর্থাৎ ‘যখন তেলাওয়াত করা হয়, তখন চুপ থাকো।’

যেন আল্লাহ এবং রাসুল উভয়ের আদেশ, ‘যখন ইমাম কেরাত পাঠ করবে মুজাদি তখন চুপ থাকেব। এই আয়াত এবং হাদিস উস্তাদজির বিপক্ষে ছিল। তাই এই হাদিসকে শহিদ তথা বাতিল সাব্যস্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। বললেন, আবু খালেদ আহমার ‘মুতাফাররাদ’ তথা একক, যে কারণে এই হাদিস মিথ্যা এবং আবু খালেদ আহমারের কোনো অনুসারী দুনিয়ার কোনো হাদিসের কিতাবে নেই। এ ব্যাপারে আনওয়ার শাহ কাশ্মিরির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনিও তার কোনো অনুসারি দেখেননি। আমি আট-দশটি মুনাজারায় বিষয়টি উঠিয়েছি; কিন্তু কেউই সদুত্তর দিতে পারেনি।

আমিতো মুতালাআ করে বসেছিলাম, তাই উস্তাদজির জঘন্য মিথ্যাচারের কারণে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিলো।

উস্তাদজির সদয় দৃষ্টি আমার ওপর নিপতিত হলো। বললেন, ‘হে হানাফি! খালেদের কোনো অনুসারী কি আছে?’ অথচ বাস্তবতা হলো, আমি তখনো হানাফি হইনি। আমি বললাম, ‘উস্তাদজি! আপনি তো উপরের দিকে মুখ করে বসে আছেন, এভাবে অনুসারী কীভাবে দেখবেন? কিতাবের দিকে সামান্য

উস্তাদজি এবার রাগে হিতাহিত জ্ঞান হরিয়ে ফেললেন এবং গালাগাল শুরু করলেন।

আমি তখন পকেট থেকে তাসবিহ'র ছড়া বের করে উস্তাদজির সামনে রাখলাম।

উস্তাদজি বললেন, এটা কি?

আমি বললাম, তাসবিহ। আপনি আপনার গালির যে তাসবিহ আছে, তা পূরণ করে আমাকে বলুন যে, আপনার সামনের এই কিতাবের মাঝে উল্লেখিত মুতাবি' কেন আপনি দেখেননি?

একথা বলামাত্রই তিনি আমাকে লাঠি দ্বারা মারতে শুরু করলেন এবং আমাকে মাদরাসা থেকে বের করে দিলেন।

এখন আমি 'ইলাউস সুনান' এবং হযরত মাওলানা হাসান সাহেব 'মুহাদিসে ফয়েজপুরি রাহ.'র কিতাব 'সিতায়ে জরুরিয়াহ', 'আদদলিলুল মুবিন' ইত্যাদী পড়তে লাগলাম। কিন্তু মাথা থেকে 'গায়রে মুকাল্লিদিয়াত' তখনো বের হচ্ছিলো না। যখনই ফেকাহ'র কোনো মাসআলা দেখতাম, তার জন্য হাদিসের পিছনে ছুটতাম। অর্থাৎ সেই ফিকাহ'র পিছনে কোনো হাদিস আছে কি না, সেটা তালাশ করতাম।

কয়েকমাস পর আমার চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আসলো এবং মন পাণ্টে গেল। এখন আমি কোনো আয়াত এবং হাদিস পড়লে মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে, এর যে অর্থ আমার বুঝে এসেছে, তা কি মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির মতো নতুন নাকি আকাবির ও আসলাফগণও এটাই বুঝেছেন।

এখন নিজের মতামত আর নিজের জ্ঞানের উপর পূর্ণ নির্ভরতার রোগ অন্তর থেকে বের হয়ে গেল এবং আমি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফি-দেওবন্দি মতাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলাম।

দুআ করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে এই সত্য মতাদর্শের উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করেন। আমিন, ইয়া রাক্বাল আলামিন।

বইটি কেন পড়বেন

প্রাইমারি লেভেল শেষ করে কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহা আর আকাশসম আশা নিয়ে 'লা-মাজহাবি' মাদরাসায় ভর্তি হলো এক বালক। লা-মাজহাবি আকিদায় দীক্ষিত করে গড়ে তুলতে শুরু করলেন আহলে হাদিস শিক্ষক। দিন যায়, সময় যায়, বালকের দীক্ষাও বাড়তে থাকে। একসময় মাজহাব বিরোধিতার নামে বালক হয়ে ওঠে চরম হানাফি-বিদ্বৈষী। অন্তরে গঁথে যায়—হানাফি মানেই হাদিস-বিরোধী।

কিন্তু...

সময়ের পালাবদলে পরবর্তীতে সেই হানাফি-বিদ্বৈষী ছেলেটি হয়ে গেল হানাফি মাজহাবের ভাষ্যকার। হয়ে গেল লা-মাজহাবিদের ত্রাস। সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করলেন 'মুনাজিরে আহ-নাফ' নামে।

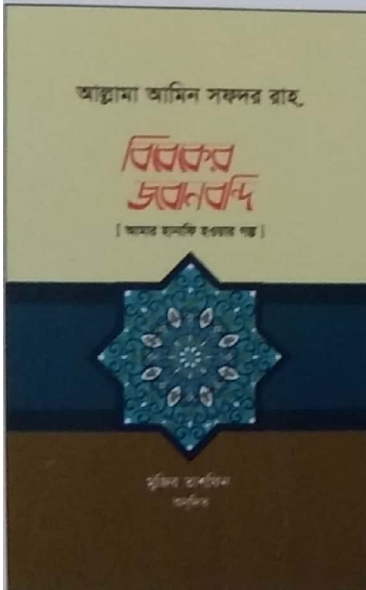
কী ছিল তাঁর হানাফি হবার কারণ? কী এমন ঘটেছিল, যার কারণে হানাফিদের প্রতি দীর্ঘদিনের জমানো বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে তাঁর অন্তরে হানাফি মাজহাবের প্রতি ভালোবাসা আর আকর্ষণ জন্ম নিল?

কী ছিল নেপথ্য কারণ?

জানতে হলে বইটি পড়ুন...



Kalantor Prokashoni



Bibeker Jobanbondi
by Allama Amin Safdar Rah.
Translated by Mujeeb Tashfin

Kalantor Prokashoni
Cover : Kazi Sofwan

Price: BD ৳ 35, US \$ 2, UK £ 1
+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
facebook.com/kalantorprokashoni

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, ওয়াফি লাইফ বইবাজার,